#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত
EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

22nd Jun to 27th Jun 2026

INDEX

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ১** ____ **01**
   1.1. সমাজ ____ 01
      1.1.1. ভারতের নিম্ন-প্রজনন হারের ভবিষ্যৎকে টিকিয়ে রাখা ____ 01
2. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** ____ **06**
   2.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা ____ 06
      2.1.1. পিতৃত্বের বিরোধে ডিএনএ পরীক্ষা: সত্য, গোপনীয়তা এবং ন্যায়ের ভারসাম্য রক্ষা ____ 06
      2.1.2. আইনের ওপর কারও একাধিপত্য থাকা উচিত নয় ____ 09
3. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** ____ **14**
   3.1. অর্থনীতি ____ 14
      3.1.1. ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বহুল প্রচারিত গল্পের পেছনের ফাটলসমূহ ____ 14
   3.2. পরিবেশ ____ 18
      3.2.1. ভারতের খণ্ডবিখণ্ড শিল্প জলবায়ু কৌশল: শিল্পকারখানার কার্বনমুক্তকরণের অনুপস্থিত যোগসূত্র ____ 18

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. সমাজ

1.1.1. ভারতের নিম্ন-প্রজনন হারের ভবিষ্যৎকে টিকিয়ে রাখা

কেন এটি খবরে রয়েছে?

সর্বশেষ নমুনা নিবন্ধন পদ্ধতি বা **স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম** (SRS)-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতের **মোট প্রজনন হার** (TFR) কমে নারী প্রতি ১.৯ সন্তানে দাঁড়িয়েছে, যা জাতীয় স্তরে এই প্রথমবার জনসংখ্যা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় স্তর ২.১-এর নিচে নেমে গেছে।

এটি ভারতের জন্য একটি বড় পরিবর্তন নির্দেশ করে; দেশ এখন জনসংখ্যা বিস্ফোরণের উদ্বেগ কাটিয়ে প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রমিকের অভাব, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা টিকিয়ে রাখার মতো নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

প্রধান জনসংখ্যাগত প্রবণতা

সূচক	বর্তমান স্থিতি
১. ভারতের মোট প্রজনন হার (TFR)	**১.৯**
২. প্রতিস্থাপন প্রজনন হার (Replacement Fertility Rate)	**২.১**
৩. বৈশ্বিক গড় প্রজনন হার (TFR)	**২.২**
৪. শহুরে প্রজনন হার (Urban TFR)	**১.৫**
৫. গ্রামীণ প্রজনন হার (Rural TFR)	**প্রায় ২.১**

প্রজনন হারে রাজ্যভিত্তিক বৈচিত্র্য

ক. অত্যন্ত কম প্রজনন হারের রাজ্যসমূহ

- **দিল্লি (TFR ১.২):** উচ্চ নগরায়ণ, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, দেরিতে বিয়ে এবং কর্মমুখী জীবনযাত্রার কারণে পরিবারের আকার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- **কেরালা (TFR ১.৩):** উচ্চ নারী সাক্ষরতা, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে দীর্ঘ সময় ধরে প্রজনন হার কম রয়েছে।
- **তামিলনাড়ু (TFR ১.৩):** জনসংখ্যা স্থিতিশীলকরণে প্রাথমিক সাফল্য, শহুরে বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত কম জন্মহারে অবদান রেখেছে।
- **পশ্চিমবঙ্গ (TFR ১.৩):** উচ্চ শিক্ষার স্তর, নগরায়ণ এবং ছোট পরিবারের প্রতি সামাজিক পছন্দের পরিবর্তন প্রজনন হার কমিয়ে দিয়েছে।

খ. উচ্চ প্রজনন হারের রাজ্যসমূহ

- **বিহার (TFR ২.৯):** নারী শিক্ষার নিম্ন হার, বাল্যবিয়ে, দারিদ্র্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সুযোগের কারণে এখানে প্রজনন হার এখনও উঁচুতে রয়েছে।

- **উত্তর প্রদেশ (TFR ২.৬):** বিশাল গ্রামীণ জনসংখ্যা, বড় পরিবারের প্রতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পছন্দ এবং অসম উন্নয়ন উচ্চ প্রজনন হারে ভূমিকা রাখছে।
- **মধ্যপ্রদেশ (TFR ২.৪):** পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হলেও শিক্ষার নিম্ন হার এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীলতা প্রজনন হারকে তুলনামূলকভাবে উঁচুতে ধরে রেখেছে।
- **রাজস্থান (TFR ২.৩):** ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক রীতিনীতি, বাল্যবিয়ে এবং সামাজিক উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য প্রজনন হারকে প্রতিস্থাপনের স্তরের ওপরে রেখেছে।

ভারতের জনসংখ্যাগত রূপান্তর বোঝা

- **হ্রাসমান জন্মহার:** ভারতের মোট প্রজনন হার প্রতিস্থাপন স্তরের নিচে নেমে গেছে, যার ফলে পরিবার প্রতি কম শিশুর জন্ম হচ্ছে।
- **স্বল্প মৃত্যুহার বজায় থাকা:** স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, পুষ্টি এবং চিকিৎসা প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি ধীর হওয়া:** জন্মহার হ্রাস এবং মৃত্যুহার কম থাকার কারণে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি ধীরে ধীরে ধীর হয়ে আসছে।
- **প্রবীণদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি:** জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বয়োজ্যেষ্ঠদের দলে প্রবেশ করছে, যা সমাজে প্রবীণ নাগরিকদের অনুপাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।
- **ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনসংখ্যা:** ভারতে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণদের সংখ্যা আজকের প্রায় ১৫ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ৩৪ কোটি ৭০ লাখে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
- **নির্ভরশীলতার কাঠামোয় বদল:** ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মানুষ প্রবীণ হবেন, যা পেনশন, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থার চাহিদা অনেক বাড়িয়ে দেবে।

ভারতের নিম্ন-প্রজনন হারের ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **ধনী হওয়ার আগেই বয়স্ক হয়ে যাওয়া**

ভারত উচ্চ স্তরের শিল্পায়ন, আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান এবং সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনের আগেই প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধির ধাপে প্রবেশ করছে। এর ফলে নির্ভরশীলতার অনুপাত বৃদ্ধি পাবে, যা সরকারের ওপর পেনশনের দায় এবং আর্থিক চাপ বাড়াবে।

২. **দুর্বল সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো**

আয়করের সীমিত আওতা এবং প্রধানত অনানুষ্ঠানিক খাতের বিশাল কর্মীবাহিনীর কারণে অবদান-ভিত্তিক (Contribution-based) পেনশন ব্যবস্থাগুলি খুব বেশি কার্যকর হচ্ছে না। **অটল পেনশন যোজনা (APY)** এবং **জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (NSAP)**-র মতো বর্তমান প্রকল্পগুলি একটি মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্যের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও আর্থিক সহায়তা দিতে পারছে না।

৩. **ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক সহায়তা ব্যবস্থার ক্ষয়**

নগরায়ণ, পরিযান, একক পরিবার ব্যবস্থা এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের ফলে বয়স্কদের দেখাশোনার ঐতিহ্যগত পারিবারিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে। এর ফলে অনেক প্রবীণ মানুষ একাকীত্ব, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং পারিবারিক সহায়তার অভাবের সম্মুখীন হচ্ছেন।

৪. স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান বোঝা

জনসংখ্যা প্রবীণ হওয়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা মাতৃস্বাস্থ্য ও সংক্রামক রোগ থেকে ক্রনিক (দীর্ঘমেয়াদী) এবং বার্ধক্যজনিত (Geriatric) রোগের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ভারতের বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত প্রবীণ রোগ বিশেষজ্ঞ, দীর্ঘমেয়াদী যত্ন কেন্দ্র এবং বয়স্ক-বান্ধব চিকিৎসা পরিষেবার অভাব রয়েছে।

৫. সরকারের ওপর ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ

জনসংখ্যার বার্ধক্যের কারণে পেনশন, স্বাস্থ্যসেবা এবং সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে আরও বেশি ব্যয়ের প্রয়োজন হবে। কিন্তু নিম্ন মাথাপিছু আয়, সীমিত কর রাজস্ব এবং আর্থিক সংকটে থাকা রাজ্যগুলির কারণে এই চাহিদা পূরণ করা সরকারের জন্য কঠিন হবে।

৬. আন্তঃরাজ্য জনসংখ্যাগত ভারসাম্যহীনতা

কেরালা এবং তামিলনাড়ুর মতো নিম্ন-প্রজনন হারের রাজ্যগুলি দ্রুত প্রবীণ জনসংখ্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তারা দিন দিন তরুণ রাজ্যগুলির পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। শিক্ষা এবং দক্ষতায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ না হলে, এই পরিযান উৎপাদনশীল বৃদ্ধির পরিবর্তে কম বেতনের অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানকেই চিরস্থায়ী করতে পারে।

জনসংখ্যাগত রূপান্তর থেকে উদীয়মান সুযোগসমূহ

১. পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যাগত সুবিধা

- **বিশাল কর্মক্ষম জনসংখ্যা:** বিহার এবং উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে তরুণদের অনুপাত বেশি, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বড় অবদান রাখতে পারে।
- **ভবিষ্যতের শ্রমশক্তির ভাণ্ডার:** অন্যান্য অনেক রাজ্যে প্রবীণদের সংখ্যা বাড়লেও এই রাজ্যগুলি ভারতের অর্থনীতিতে শ্রমিক সরবরাহ বজায় রাখবে।
- **জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা:** একটি দক্ষ ও উৎপাদনশীল কর্মীবাহিনী শিল্প উৎপাদন, সেবা খাত এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
- **অন্যান্য রাজ্যের ঘাটতি পূরণ:** উচ্চ প্রজনন হারের রাজ্যগুলির তরুণ কর্মীরা প্রবীণ রাজ্যগুলির শ্রমিকের ঘাটতি মেটাতে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখতে সাহায্য করতে পারে।

২. প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে অভ্যন্তরীণ পরিযান

- **আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস:** পরিযান কম উন্নত অঞ্চলের শ্রমিকদের উন্নত কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ পাওয়ার পথ তৈরি করে দেয়।
- **শ্রমের ঘাটতি পূরণ:** পরিযায়ী শ্রমিকরা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত এবং প্রবীণ জনসংখ্যার রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান শ্রমের চাহিদা মেটাতে পারে।
- **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** চাহিদা অনুযায়ী শ্রমশক্তির সঠিক স্থানান্তর সম্পদের সঠিক বণ্টন এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা উন্নত করে।
- **কল্যাণমূলক সুবিধার স্থানান্তরযোগ্যতা:** নিরাপদ এবং উৎপাদনশীল শ্রম গতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণমূলক সুবিধাগুলি এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরযোগ্য (Portable) হওয়া আবশ্যক।

৩. রূপালী অর্থনীতি

- **স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা:** প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হাসপাতাল, বার্ধক্যকালীন যত্ন এবং হোম-কেয়ার (বাড়িতে সেবা) পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।
- **সহায়ক আবাসন:** পারিবারিক যত্ন ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে প্রবীণদের জন্য বিশেষ আবাসন ও সহায়ক জীবনযাপন কেন্দ্রের প্রয়োজন বাড়বে।
- **বিমা খাত:** গড় আয়ু বৃদ্ধির ফলে স্বাস্থ্য, জীবন এবং দীর্ঘমেয়াদী যত্নের জন্য বিমা পণ্যগুলির চাহিদা তৈরি হবে।
- **চিকিৎসা সরঞ্জাম:** চলাচলের সহায়ক সরঞ্জাম, রোগ নির্ণয়ের যন্ত্র এবং প্রবীণদের যত্নে ব্যবহৃত প্রযুক্তির বাজার ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হবে।
- **সুস্থতা শিল্প:** প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ফিটনেস, পুষ্টি, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা এবং মানসিক সুস্থতা পরিষেবাগুলি একটি বড় বাজার হিসেবে আবির্ভূত হবে।
- **নতুন প্রবৃদ্ধি খাত:** ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনসংখ্যা একটি গতিশীল 'সিলভার ইকোনমি' বা রূপালী অর্থনীতি তৈরি করতে পারে, যা কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

ভারতের নিম্ন-প্রজনন হারের ভবিষ্যৎ টিকিয়ে রাখার উপায়

১. সর্বজনীন ন্যূনতম পেনশন স্তর প্রতিষ্ঠা করা

- **মুদ্রাস্ফীতি-সংযুক্ত সামাজিক পেনশন:** সব প্রবীণ নাগরিকের মৌলিক আয় নিশ্চিত করতে মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ন্যূনতম সামাজিক পেনশন প্রদান করা।
- **বার্ধক্যের ঝুঁকি হ্রাস:** একটি সর্বজনীন ন্যূনতম পেনশন স্তর প্রবীণ নাগরিকদের দারিদ্র্য, পরনির্ভরশীলতা এবং আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস করতে পারে।

২. পেনশন ইকোসিস্টেম বা পরিকাঠামো শক্তিশালী করা

- **পেনশনের আওতা বাড়ানো:** অটল পেনশন যোজনার মতো প্রকল্পগুলির পরিধি বিস্তার করা এবং আরও বেশি কর্মীকে এর আওতায় আনতে সরকারি সহায়তা বৃদ্ধি করা।
- **নমনীয় পেনশন পণ্য তৈরি:** অনিয়মিত এবং মরশুমী আয়ের অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত নমনীয় পেনশন মডেল তৈরি করা।

৩. একটি বার্ধক্যকালীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা

- **প্রবীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো জোরদার করা:** জেলা স্তরে ও হাসপাতালে প্রবীণদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড, হোম-কেয়ার পরিষেবা এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রবীণ যত্ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- **স্বাস্থ্য নীতিতে বার্ধক্যকে অন্তর্ভুক্ত করা: আয়ুষ্মান ভারত** এবং হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারের মতো কর্মসূচিগুলিতে প্রবীণদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসাসেবা অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. তরুণ রাজ্যগুলির মানবসম্পদে বিনিয়োগ করা

- **শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়ন:** একটি উৎপাদনশীল কর্মীবাহিনী তৈরি করতে মানসম্মত শিক্ষা, পুষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করা।
- **নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করা:** মানবসম্পদ গঠন শক্তিশালী করতে নারী শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

৫. **স্থানান্তরযোগ্য কল্যাণমূলক কাঠামো তৈরি করা**

- **কল্যাণমূলক সুবিধার স্থানান্তরযোগ্যতা:** পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গেলেও খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন এবং বিমার সুবিধা পান তা নিশ্চিত করা।
- **জাতীয় প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালী করা:** একটি নির্বিঘ্ন জাতীয় শ্রম বাজার গড়ে তুলতে **এক দেশ এক রেশন কার্ড** (ONORC) এবং **ই-শ্রম** (e-Shram)-এর মতো উদ্যোগগুলির পরিধি আরও বাড়ানো।

৬. **সক্রিয় এবং সুস্থ বার্ধক্যকে উৎসাহিত করা**

- **অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে উৎসাহ:** প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নমনীয় অবসরের বিকল্প এবং তাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।
- **সামাজিক ও মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি:** সুস্থ ও সক্রিয় বার্ধক্য নিশ্চিত করতে জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

উপসংহার

ভারতের প্রতিস্থাপন স্তরের নিচের প্রজনন হার একটি জনসংখ্যাগত সাফল্য নির্দেশ করে, তবে মনোযোগ এখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে **জনসংখ্যার যত্নের** দিকে নিতে হবে। পেনশন ব্যবস্থা, বার্ধক্যকালীন স্বাস্থ্যসেবা, কল্যাণমূলক সুবিধার স্থানান্তরযোগ্যতা এবং শ্রমশক্তির গতিশীলতা শক্তিশালী করার ওপরই নির্ভর করবে যে—বার্ধক্য ভারতের জন্য জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ (Demographic Dividend) হবে নাকি জনসংখ্যাগত বোঝা (Demographic Burden)।

Q. India has entered a low-fertility era. Examine the socio-economic and governance challenges associated with population ageing and suggest policy measures for ensuring a sustainable demographic transition. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. পিতৃত্বের বিরোধে ডিএনএ পরীক্ষা: সত্য, গোপনীয়তা এবং ন্যায়ের ভারসাম্য রক্ষা

প্রেক্ষাপট

সিপি বনাম এপি (CP vs AP) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, পিতৃত্বের বিরোধে ডিএনএ (DNA) পরীক্ষা কেবল সর্বশেষ উপায় (last resort) হিসেবেই নির্দেশ করা উচিত, যখন অন্য কোনো প্রমাণের মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করা সম্ভব নয়। এই রায়টি বৈজ্ঞানিক সত্য, গোপনীয়তা (Privacy), শিশুর মর্যাদা এবং ন্যায়ের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

মূল সাংবিধানিক নীতিসমূহ গোপনীয়তার অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১): কে. এস. পুট্টাস্বামী রায়ে এটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি কোনো ব্যক্তির শারীরিক স্বায়ত্তশাসন (bodily autonomy), বংশগত বা জেনেটিক তথ্য এবং ব্যক্তিগত মর্যাদাকে অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করে।

- **নিজের পরিচয় জানার অধিকার:** পরিচয়, উত্তরাধিকার এবং মানসিক সুস্থতার জন্য নিজের জৈবিক পিতৃত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির বৈধ স্বার্থ রয়েছে।
- **শিশুর মর্যাদা এবং সর্বোত্তম স্বার্থ:** আইন শিশুদের **অবৈধতার কলঙ্ক** থেকে রক্ষা করতে এবং তাদের সামাজিক ও আইনি মর্যাদা সুরক্ষিত করতে চায়।
- **ন্যায়ের স্বার্থ:** আদালতকে সত্য উদঘাটন করতে হবে, তবে একই সাথে এটিও নিশ্চিত করতে হবে যেন কোনো ব্যক্তির **মৌলিক অধিকার** চরমভাবে বা অসমঞ্জসভাবে লঙ্ঘিত না হয়।

আইনি কাঠামো ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA), ২০২৩ ***(পূর্ববর্তী নাম: ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭২)***

এই আইনে বৈধতার অনুমানকে (presumption of legitimacy) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, একটি বৈধ বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন কোনো শিশুর জন্ম হলে, তাকে সেই বিবাহিত দম্পতির বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য করা হবে। ফলস্বরূপ, পিতৃত্ব প্রমাণ করার দায় শিশুর ওপর বা যে ব্যক্তি পিতৃত্ব নিশ্চিত করতে চাচ্ছেন তার ওপর থাকে না, বরং যিনি পিতৃত্বকে অস্বীকার বা চ্যালেঞ্জ করছেন, প্রমাণের দায় (burden of proof) তার ওপর বর্তায়।

এই আইনি অনুমানের উদ্দেশ্যসমূহ: * **সামাজিক কলঙ্ক থেকে শিশুদের রক্ষা করা:** এটি শিশুদের 'অবৈধ' বা জারজ তকমা পাওয়ার সামাজিক ও মানসিক পরিণতি থেকে রক্ষা করে।

- **পারিবারিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা:** এটি বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা করে এবং পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ভাঙন রোধ করে।
- **গোপনীয়তা রক্ষা করা:** এটি পারিবারিক অত্যন্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে অযথা অনুসন্ধানকে নিরুৎসাহিত করে এবং ব্যক্তিগত জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করে।

অতএব, আইনি কাঠামোটি শিশুর বৈধতা ও মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেয়। এই আইনি অনুমানকে কেবল তখনই বাতিল করা যেতে পারে, যখন অত্যন্ত জোরালো, বাধ্যকারী এবং প্রয়োজনে শক্তিশালী **বৈজ্ঞানিক প্রমাণ** উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

পিতৃত্বের বিরোধে ডিএনএ পরীক্ষার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন

প্রথম পর্যায়: বৈধতা রক্ষা (সংকীর্ণ বা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি)

গৌতম কুন্ডু মামলা: ডিএনএ পরীক্ষাকে মামুলি বা রুটিন বিষয় হিসেবে নির্দেশ দেওয়া যাবে না।

- **শ্রী বেনারসি দাস মামলা:** ডিএনএ পরীক্ষার প্রতি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনর্ব্যক্ত করা হয়।
  - শুধুমাত্র কৌতুহল মেটানোর জন্য আদালতের পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।
  - সামাজিক ও পারিবারিক পরিণতি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।
  - বৈধতা রক্ষাই আদালতের প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল।
- **আদালতের মূল ফোকাস:** বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ধারণের চেয়ে বৈধতা রক্ষা এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো।

দ্বিতীয় পর্যায়: বৈজ্ঞানিক সত্যের স্বীকৃতি

রোহিত শেখর–এন.ডি. তিওয়ারি মামলা: গোপনীয়তার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আদালত ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দেয়।

- **নন্দলাল বাসুদেও বাদওয়াইক মামলা:** আইনি অনুমানের চেয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
  - ডিএনএ প্রমাণকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং **চূড়ান্ত** হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
  - ন্যায়বিচারের স্বার্থে আদালতকে বৈজ্ঞানিক সত্য বিবেচনা করতে হবে।
  - প্রমাণিত জৈবিক সত্যের বিরুদ্ধে আইনি কল্পনা বা অনুমান টিকতে পারে না।
- **দীপান্বিতা রায় মামলা:** মামলার মীমাংসার জন্য প্রয়োজনীয় মনে হলে ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।
  - পরীক্ষা করতে অস্বীকার করলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে **প্রতিকূল অনুমান** (adverse inference) হিসেবে গণ্য হতে পারে।
  - বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বিরোধপূর্ণ তথ্য সমাধানে সহায়তা করতে পারে।
- **আদালতের মূল ফোকাস:** নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মাধ্যমে সত্য উদঘাটন করা।

তৃতীয় পর্যায়: গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি

কে. এস. পুট্টাস্বামী মামলা: গোপনীয়তাকে অনুচ্ছেদ ২১-এর অধীনে একটি মৌলিক অধিকার (Fundamental Right) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

- **আদালতের মূল ফোকাস:** গোপনীয়তা, শারীরিক স্বায়ত্তশাসন এবং জেনেটিক তথ্যের সুরক্ষা।

চতুর্থ পর্যায়: সত্য এবং গোপনীয়তার ভারসাম্য রক্ষা

অপর্ণা অজিন্ক্য ফিরোদিয়া মামলা: ডিএনএ পরীক্ষা কেবল তখনই নির্দেশ করা উচিত যখন এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

- **ইভান রথিনাম মামলা** (Ivan Rathinam Judgment)**:** গোপনীয়তা বা সত্য জানার অধিকার—কোনোটিই **পরম বা সীমাহীন** (absolute) নয়।
  - আদালতকে পারস্পরিক বিরোধী সাংবিধানিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

- শিশুর মর্যাদা এবং সামাজিক পরিণতি সবসময় প্রাসঙ্গিক থাকবে।
- পরীক্ষাটি করা যৌক্তিক কি না, তা কেবল এর প্রয়োজনীয়তা দেখেই নির্ধারণ করতে হবে।

- **সিপি বনাম এপি মামলা (CP vs AP Judgment):** ডিএনএ পরীক্ষা তখনই গ্রহণযোগ্য যখন পিতৃত্ব সরাসরি বিরোধের মধ্যে থাকে।
  - বিষয়টি সমাধানের জন্য বিদ্যমান প্রমাণ অপর্যাপ্ত হতে হবে।
  - ন্যায়ের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ধারণ অপরিহার্য হতে হবে।
  - এই পরীক্ষাটিকে অবশ্যই আনুপাতিকতার শর্ত পূরণ করতে হবে।
- **বর্তমান অবস্থান:** ডিএনএ পরীক্ষা হলো একটি **সর্বশেষ উপায় (measure of last resort)**, যা কেবল তখনই অনুমোদিত যখন এটি ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, আনুপাতিক এবং অপরিহার্য।

চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যাসমূহ

- **গোপনীয়তার উদ্বেগ:** বাধ্যতামূলক ডিএনএ পরীক্ষার ফলে সংবেদনশীল জেনেটিক তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য করা হতে পারে, যা সরাসরি শারীরিক স্বায়ত্তশাসনকে প্রভাবিত করে। এটি ব্যক্তিগত জৈবিক তথ্যের অপব্যবহার, অননুমোদিত অ্যাক্সেস বা দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়।
- **শিশুর মর্যাদার ওপর প্রভাব:** পিতৃত্বের বিরোধ শিশুদের অবৈধতার সামাজিক কলঙ্ক এবং মানসিক আঘাতের মুখোমুখি করতে পারে। এটি পারিবারিক স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘদিনের পিতা-মাতার সম্পর্কের মধ্যেও ফাটল ধরাতে পারে।
- **আইনি অনুমান এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব:** সাক্ষ্য আইনের অধীনে বৈধতার আইনি অনুমান কখনো কখনো চূড়ান্ত ফরেনসিক ডিএনএ ফলাফলের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। এটি পারিবারিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং জৈবিক সত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে একটি বড় উত্তেজনা তৈরি করে।
- **নৈতিক উদ্বেগ:** ডিএনএ পরীক্ষা সম্মতির (consent) বিষয়টিকে সামনে আনে, বিশেষ করে যখন ব্যক্তিদের আদালত দ্বারা পরীক্ষা করতে বাধ্য করা হয়। ব্যক্তিগত বিরোধে এর অপব্যবহার এবং জেনেটিক তথ্যের অনৈতিক হ্যান্ডলিংয়ের ঝুঁকিও থাকে।
- **বিচারিক ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা (Judicial Subjectivity):** "প্রয়োজনীয়তা" এবং "আনুপাতিকতা"-র মতো শব্দগুলো ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল, যার ফলে বিভিন্ন আদালতের রায়ে অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। এটি একই ধরনের পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ফলাফলের জন্ম দিতে পারে।

পথ নির্দেশ

1. **ডিএনএ পরীক্ষাকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে গ্রহণ করা:** ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ কেবল তখনই দেওয়া উচিত যখন অন্য কোনো প্রমাণ পিতৃত্বের প্রশ্নটি কার্যকরভাবে সমাধান করতে পারে না। এটি আদালতের সত্য উদঘাটনের প্রক্রিয়া সচল রাখার পাশাপাশি গোপনীয়তায় ন্যূনতম হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করে।

1. **উপাত্ত সুরক্ষা বা ডেটা সুরক্ষা জোরদার করা:** জেনেটিক তথ্যের অপব্যবহার এবং অননুমোদিত অ্যাক্সেস রোধ করতে এর সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের জন্য কঠোর আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন। তথ্যগত গোপনীয়তা এবং শারীরিক স্বায়ত্তশাসন রক্ষার জন্য এটি অপরিহার্য।

2. **শিশু-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Child-Centric Approach):** আদালতকে অন্যান্য সমস্ত স্বার্থের ঊর্ধ্বে শিশুর মর্যাদা, কল্যাণ এবং মানসিক সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সামাজিক কলঙ্ক এবং মানসিক ক্ষতি থেকে শিশুকে রক্ষা করাই হবে প্রধান লক্ষ্য।

3. **অভিন্ন বিচারিক নির্দেশিকা (Uniform Judicial Guidelines):** কখন ডিএনএ পরীক্ষা প্রয়োজনীয় তা নির্ধারণে আদালতগুলোকে গাইড করার জন্য স্পষ্ট এবং মানসম্মত মানদণ্ড তৈরি করা উচিত। এটি অসঙ্গতি কমাবে এবং বিচারিক পূর্বাভাসযোগ্যতা নিশ্চিত করবে।
4. **আনুপাতিকতার মাধ্যমে অধিকারের ভারসাম্য রক্ষা:** সত্যের প্রয়োজনের সাথে গোপনীয়তার ভারসাম্য বজায় রাখতে কে. এস. পুট্টাস্বামী রায়ে দেওয়া **আনুপাতিকতার পরীক্ষা (proportionality test)** কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আদালতকে নিশ্চিত করতে হবে যেন সবচেয়ে কম হস্তক্ষেপকারী বিকল্পটি বেছে নেওয়া হয়।
5. **গোপন বিচারিক প্রক্রিয়া (Confidential Handling of Proceedings):** সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের গোপনীয়তা এবং সুনাম রক্ষার জন্য পিতৃত্ব সংক্রান্ত ডিএনএ মামলাগুলো অত্যন্ত কঠোর গোপনীয়তার সাথে পরিচালনা করা উচিত। এটি অপ্রয়োজনীয় জনসমক্ষে প্রকাশ এবং সামাজিক কলঙ্ক রোধ করবে।

উপসংহার

ভারতীয় আইনশাস্ত্র বা বিচারব্যবস্থা শুধুমাত্র শিশুর বৈধতা রক্ষা করার পুরনো অবস্থান থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে গোপনীয়তা ও মর্যাদার ভারসাম্য রক্ষার স্তরে উন্নীত হয়েছে। পুট্টাস্বামী রায়ের পর, ডিএনএ পরীক্ষাকে কেবল একটি সর্বশেষ উপায় হিসেবে অনুমতি দেওয়া হয়, যা নিশ্চিত করে যে সত্যের সন্ধান যেন সর্বদা মানুষের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার এবং মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

*Q. **The Supreme Court has evolved a nuanced approach in ordering DNA tests in paternity disputes, balancing scientific truth with privacy and dignity.** Discuss in the context of post-Puttaswamy jurisprudence. 15 Marks*

2.1.2. আইনের ওপর কারও একাধিপত্য থাকা উচিত নয়

কেন এটি সাম্প্রতিক খবরে এসেছে?

জন বিশ্বাস আইনের (Jan Vishwas Act) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা প্রস্তাব করেছেন যে, সরকারের সমস্ত অধ্যাদেশ, নিয়মাবলী, মানদণ্ড, নির্দেশিকা এবং বিজ্ঞপ্তি একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা উচিত। বিশেষ করে **ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস (IRC)** এবং **ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (BIS)**-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর জারি করা বিভিন্ন মানদণ্ডে জনসাধারণের বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের পর এই বিষয়টি সবার নজরে আসে।

ভূমিকা

একটি সুস্থ গণতন্ত্রের অন্যতম দাবি হলো দেশের নাগরিকরা তাদের নিয়ন্ত্রণকারী আইন, কানুন এবং মানদণ্ডগুলো সম্পর্কে জানবেন। তবে, আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও সরকারের জারি করা অনেক মানদণ্ড এবং নিয়মাবলী সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বা দুর্গম রয়ে গেছে। **"আইনের ওপর কারও একাধিপত্য থাকা উচিত নয়"**—এই মূল নীতিটি জোর দিয়ে বলে যে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সচেতন নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইনি নিয়ম ও জননিরাপত্তার মানদণ্ডগুলো সর্বদা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত (Public Domain) থাকা আবশ্যক।

সরকারি অধ্যাদেশ বা আদেশনামা কী?

সরকারি অধ্যাদেশ বা আদেশনামা বলতে সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নির্দেশনাবলীকে বোঝায়, যা নাগরিকদের আচরণ এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

উদাহরণ

- সংসদ কর্তৃক পাস হওয়া **আইন এবং অ্যাক্টসমূহ**
- **নিয়ম এবং প্রবিধান** (Rules and Regulations)
- **সরকারি আদেশ** (Government Orders - GOs)
- **পরিপত্র এবং বিজ্ঞপ্তি** (Circulars and Notifications)
- **স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরাস** (SOPs)
- **নির্দেশিকা এবং পরামর্শাবলী** (Guidelines and Advisories)
- **জননিরাপত্তা সংক্রান্ত মানদণ্ড** (যেমন—BIS, IRC ইত্যাদি)

গুরুত্ব

- **নাগরিকদের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করে:** এগুলো নির্দিষ্ট করে দেয় যে নাগরিকরা কী করতে পারবেন, কী করা তাদের কর্তব্য বা কোন কাজগুলো নিষিদ্ধ। এর মাধ্যমে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়।
- **পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং নিয়মের প্রয়োগ পরিচালনা করে:** এগুলো সরকারি সংস্থাগুলোকে আইন বাস্তবায়ন, নিয়ম কার্যকর এবং দেশজুড়ে অভিন্ন শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর পরিকাঠামো প্রদান করে।
- **বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি তৈরি করে:** আদালত, ট্রাইব্যুনাল এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ আইন ব্যাখ্যা করার সময় এবং বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তি করার সময় প্রায়শই এই মানদণ্ড ও নিয়মাবলীর ওপর নির্ভর করে।

সরকারি মানদণ্ডে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার কেন গুরুত্বপূর্ণ?

1. **আইনের শাসনকে শক্তিশালী করে:** জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের নিয়ন্ত্রণকারী আইন ও মানদণ্ড সম্পর্কে জানতে পারেন। এর ফলে তারা স্বেচ্ছায় আইন মেনে চলতে পারেন এবং প্রশাসনের স্বৈরাচারী বা খামখেয়ালী আচরণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।
2. **স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে:** উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার সাধারণ নাগরিক, গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজকে (Civil Society) সরকারের কাজকর্মের ওপর নজর রাখার সুযোগ দেয়, যা একটি দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে।
3. **গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বাড়ায়:** আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক তথ্যের সহজলভ্যতা নাগরিকদের জনসাধারণের বিভিন্ন বিতর্ক, আলোচনা এবং নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশ নিতে ক্ষমতায়ন করে।
4. **অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে:** মানদণ্ডগুলো সহজে পাওয়া গেলে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে **MSME (ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প)** এবং স্টার্টআপগুলোর জন্য নিয়মকানুন মেনে চলা সহজ হয়, ব্যবসার খরচ কমে এবং বাজারে তাদের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বাড়ে।
5. **জননিরাপত্তা নিশ্চিত করে:** নিরাপত্তা সংক্রান্ত মানদণ্ডগুলো জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য হলে সাধারণ মানুষ, পেশাদার ব্যক্তি এবং শিল্পক্ষেত্রগুলো এমন সেরা উপায়গুলো (Best Practices) বেছে নিতে পারে যা জীবন, স্বাস্থ্য এবং সম্পত্তি রক্ষা করে।
6. **গবেষণা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে:** উন্মুক্ত মানদণ্ডগুলো জটিল কারিগরি তথ্যের বাধা দূর করে একাডেমিক গবেষণা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং জ্ঞান ভাগাভাগি করার প্রক্রিয়াকে সহজতর করে।

সাংবিধানিক এবং আইনি ভিত্তি

1. **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ক): বাক ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার** (Article 19(1)(a)) আইন, নিয়মকানুন এবং মানদণ্ড জানার অধিকার হলো নাগরিকদের সচেতনভাবে মতামত প্রকাশ, নিজেদের মেলে ধরা এবং কার্যকরভাবে **তথ্য জানার অধিকার** (RTI) প্রয়োগ করার একটি পূর্বশর্ত।
2. **অনুচ্ছেদ ১৪: আইনের চোখে সমতা** (Article 14) আইনি তথ্যের সমান প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে যে দেশের সব নাগরিক সমানভাবে আইনের অধীন এবং আইনের দ্বারা সুরক্ষিত থাকবেন। এটি তথ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য বা অসমতা দূর করে।
3. **অনুচ্ছেদ ২১: জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার** (Article 21) নিরাপত্তার মানদণ্ড এবং নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মগুলোতে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকলে নাগরিকরা তাদের অধিকার ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন, যা তাদের জীবন, স্বাস্থ্য ও মর্যাদাকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।
4. **তথ্য জানার অধিকার আইন, ২০০৫** (Right to Information Act, 2005) এই আইনটি সরকারের কাছে থাকা তথ্যগুলোর স্বচ্ছতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের (Proactive Disclosure) ওপর জোর দেয়, যা আইন, নিয়ম, মানদণ্ড এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলোতে নাগরিকদের প্রবেশাধিকারকে আরও শক্তিশালী করে।

সরকারি মানদণ্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা বা চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **টাকা বা ফির বিনিময়ে প্রবেশাধিকার:** মানদণ্ড বা নিয়মগুলো ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ফি বা টাকা ধার্য করার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়াতে বাধা সৃষ্টি হয়। এর ফলে বিশেষ করে শিক্ষার্থী, গবেষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা এবং সাধারণ নাগরিকদের জন্য আইনানুগ নিয়মকানুন মেনে চলা বা বাধ্যবাধকতা পূরণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

২. **বিক্ষিপ্ত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো:** প্রয়োজনীয় নিয়ম ও মানদণ্ডগুলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, নিয়ামক সংস্থা এবং আলাদা আলাদা ওয়েবসাইটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার কারণে আসল ও নির্ভরযোগ্য আইনি প্রয়োজনীয়তাগুলো খুঁজে বের করা এবং তা সংগ্রহ করা অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

৩. **ছায়া প্রবিধান বা অলিখিত নিয়ম:** প্রশাসনে এমন প্রচুর পরিপত্র, পরামর্শাবলী এবং বিভাগীয় নির্দেশনাবলী রয়েছে যা সরকারি শাসনব্যবস্থা ও নিয়ম পালনের প্রক্রিয়াকে সরাসরি প্রভাবিত করে, অথচ এগুলো জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছায় না বা সহজলভ্য নয়।

৪. **সীমিত ডিজিটাল সহজলভ্যতা:** অনেক সরকারি মানদণ্ড অনুসন্ধানযোগ্য, যন্ত্র-পাঠযোগ্য বা ব্যবহারকারী-বান্ধব ডিজিটাল মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এর ফলে সেগুলোর ব্যবহারিক উপযোগিতা অনেকটাই কমে যায়।

৫. **কপিরাইট এবং মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ:** যেসব মানদণ্ড বা নিয়ম মূলত আইন হিসেবে কাজ করে, সেগুলোর ওপর মেধা সম্পত্তির অধিকার বা কপিরাইট দাবি করার ফলে বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং নাগরিকদের আইনি নিয়ম জানার অধিকারের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব বা উত্তেজনা তৈরি হয়।

বাস্তব উদাহরণ বা ঘটনা সমীক্ষা: ভারতীয় মানদণ্ড ব্যুরো

- **পূর্ববর্তী পরিস্থিতি:**
  - এই সংস্থার মানদণ্ডগুলো মূলত নির্দিষ্ট ফির বিনিময়ে কিনতে হতো।
  - শাসনতান্ত্রিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের জন্য এর সহজলভ্যতা ছিল খুবই সীমিত (বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে)।
- **ফলাফল:**
  - আইনি ও নীতিগত নানামুখী আলোচনার পর, এই সংস্থা তাদের মানদণ্ডগুলো অনলাইনে বিনামূল্যে সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করতে শুরু করে।

- এর ফলে প্রতিষ্ঠানের জনকল্যাণমূলক উপযোগিতা না কমিয়েই জনসাধারণের প্রবেশাধিকার উন্নত করা সম্ভব হয়েছে।

- **মূল শিক্ষা:**
  - মানদণ্ড বা নিয়মগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিলে তা প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে না, বরং নিয়মকানুন মানার প্রবণতা এবং জনসচেতনতা আরও শক্তিশালী করে।

বৈশ্বিক সেরা উদাহরণ ও চর্চা

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:**
  - দেশটির সর্বোচ্চ আদালতের মূল নীতি: **"আইনের ওপর কারও একাধিপত্য বা ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না।"**
  - সরকারের সমস্ত আইনি নথিপত্র সাধারণত জনসাধারণের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে।
- **ইউরোপীয় ইউনিয়ন:**
  - বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা মানদণ্ডগুলোকে আইনের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।
  - সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকারকে একটি সর্বোচ্চ জনস্বার্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- **যুক্তরাজ্য:**
  - তারা রাজকীয় কপিরাইট ব্যবস্থা ব্যবহার করে।
  - তবে উন্মুক্ত সরকারি লাইসেন্সের মাধ্যমে এগুলোকে ব্যাপকভাবে পুনরায় ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।

জন বিশ্বাস কাঠামো এবং শাসন সংস্কার

প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ

- একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার বা মাধ্যমে সরকারের সমস্ত অধ্যাদেশ ও আদেশনামা প্রকাশ করা।
- অপ্রকাশিত কোনো আইনি দলিল বা নির্দেশিকার কোনো আইনি বৈধতা থাকবে না।
- **"ছায়া প্রবিধান"** বা অলিখিত নিয়মগুলোর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানো।
- নিয়মকানুন মেনে চলার প্রক্রিয়া এবং শাসনব্যবস্থাকে আরও সহজতর করা।

শাসনতান্ত্রিক সুবিধাসমূহ

- **স্বচ্ছতা:** সমস্ত আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক দলিলে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হলে সরকারের কার্যকলাপে উন্মুক্ততা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।
- **পূর্বাভাসযোগ্যতা:** স্পষ্টভাবে প্রকাশিত নিয়মাবলীর কারণে নাগরিক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং আরও বেশি নিশ্চিততার সাথে তাদের কার্যক্রমের পরিকল্পনা করতে পারে।
- **ব্যবসা করার সহজ পরিবেশ:** সহজে পাওয়া যায় এমন নিয়মকানুন তথ্যের বাধা দূর করে, আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণ সহজ করে এবং একটি বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করে।
- **মামলা-মোকদ্দমা হ্রাস:** আইনের অধিক স্পষ্টতা এবং সহজলভ্যতা অস্পষ্টতা, অজ্ঞতা বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে তৈরি হওয়া আইনি বিরোধগুলোকে অনেকটাই কমিয়ে আনে।
- **উন্নত নিয়মানুবর্তিতা:** নাগরিক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো যখন প্রযোজ্য মানদণ্ড ও নিয়মগুলো সহজে বুঝতে ও দেখতে পারে, তখন তাদের পক্ষে সেই নিয়মগুলো মেনে চলার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

ভবিষ্যতের পথ বা সমাধান

১. **একটি সমন্বিত আইনি তথ্য পোর্টাল তৈরি করা:** একটি বর্ধিত একক জাতীয় আইনি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা উচিত, যা সমস্ত আইন, মানদণ্ড, প্রবিধান এবং সরকারি নির্দেশাবলীতে সহজে প্রবেশের সুযোগ দেবে।

২. **"স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্মুক্ত" নীতি গ্রহণ করা:** সরকারি নিয়ম ও মানদণ্ডগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত; কেবল জাতীয় নিরাপত্তা বা গোপনীয়তার মতো ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলোতেই এতে বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

৩. **কপিরাইট কাঠামো সংশোধন করা:** ভারতের উচিত একটি **"সরকারি কাজ"** সংক্রান্ত আইনি নীতি গ্রহণ করা, যাতে আইনি বা নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতাসম্পন্ন সমস্ত নথি জনসাধারণের জন্য সর্বদা বিনামূল্যে সহজলভ্য থাকে।

৪. **নিয়ন্ত্রণমূলক তথ্যের ডিজিটালাইজেশন এবং মানদণ্ড নির্ধারণ:** অনুসন্ধানযোগ্য এবং যন্ত্র-পাঠযোগ্য মাধ্যমে নিয়মকানুন প্রকাশ করলে তা ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা এবং নিয়মকানুন মেনে চলার প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করবে।

৫. **স্বতঃস্ফূর্ত তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:** সরকারি সংস্থাগুলোর উচিত তথ্য জানার অধিকার আইনের মূল চেতনা মেনে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক তথ্য প্রকাশ করা, যাতে নাগরিকদের ব্যক্তিগতভাবে তথ্য চেয়ে আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা কমে যায়।

৬. **নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার স্থাপন করা:** যাচাইকৃত সরকারি তথ্যভাণ্ডারগুলোকেই আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক তথ্যের একমাত্র সরকারি উৎস হিসেবে কাজ করতে হবে, যাতে তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করা যায় এবং ভুল তথ্য ছড়ানো রোধ করা সম্ভব হয়।

উপসংহার

গণতন্ত্র তখনই সবচেয়ে ভালো কাজ করে যখন আইন সবার চোখে দৃশ্যমান, বোধগম্য এবং সহজলভ্য হয়। সরকারি মানদণ্ড এবং নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশিকাগুলো বিনামূল্যে সবার জন্য উন্মুক্ত করলে তা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নাগরিক অংশীদারিত্ব এবং আইনের শাসনকে আরও শক্তিশালী করবে; যা নিশ্চিত করবে যে **জনসাধারণের জ্ঞান আসলেই একটি সাধারণ জনসম্পদ হিসেবে থাকবে**।

Q. Access to law is a prerequisite for democratic governance and rule of law. Discuss the need for making government standards, regulations, and public safety norms freely accessible to citizens. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

3.1. অর্থনীতি

3.1.1. ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বহুল প্রচারিত গল্পের পেছনের ফাটলসমূহ

খবরের শিরোনামে কেন?

মোট দেশজ উৎপাদন বা **GDP-র শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস** থাকা সত্ত্বেও, ভারতের কাঠামোগত অর্থনৈতিক দুর্বলতাগুলো নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এর মধ্যে রয়েছে বহির্বিশ্বের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ, প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতার অভাব, আর্থিক চাপ এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যে গ্রামীণ চাহিদার হ্রাস।

অর্থনৈতিক দুর্বলতা নির্দেশকারী মূল সূচকসমূহ

সূচক	বর্তমান অবস্থা
অপরিশোধিত তেল আমদানির ওপর নির্ভরতা	প্রায় ৯০%
প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির ওপর নির্ভরতা	প্রায় ৫০%
আরবিআই (RBI)-এর বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে হস্তক্ষেপ (অর্থবছর ২০২৫-২৬)	৫৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি
বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ	প্রায় ৬৮১ বিলিয়ন ডলার
বার্ষিক প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স (অর্থবছর ২০২৪-২৫)	১৩৫ বিলিয়ন ডলার
বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারী (FPI) দ্বারা পুঁজি প্রত্যাহার	২.২ লাখ কোটি টাকা

ভারতের অর্থনীতির প্রধান কাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **বহির্বিশ্বের ওপর উচ্চ নির্ভরতা**

- **ভারী আমদানি নির্ভরতা:** ভারত তার প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেল, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG), সার, সেমিকন্ডাক্টর (চিপ) এবং উন্নত প্রযুক্তির জন্য আমদানির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, যা অর্থনীতিকে বিদেশী সরবরাহের অধীন করে তোলে।
- **বাহ্যিক ধাক্কার প্রতি সংবেদনশীলতা:** ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিপর্যয় এবং বিশ্ববাজারে দামের ওঠানামা সহজেই দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে পারে, টাকার মান দুর্বল করতে পারে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত করতে পারে।

২. **জ্বালানি নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ**

- **আমদানি-নির্ভর জ্বালানি খাত:** ভারতের প্রায় ৯০% অপরিশোধিত তেল এবং প্রায় ৫০% প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা আমদানির মাধ্যমে মেটানো হয়, যা দেশকে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি বাজারের অস্থিরতার মুখোমুখি দাঁড় করায়।
- **সামষ্টিক অর্থনীতিতে প্রভাব:** জ্বালানির ক্রমবর্ধমান দাম উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়, বাণিজ্য ঘাটতি আরও চওড়া করে, মুদ্রাস্ফীতিকে উসকে দেয় এবং টাকার মূল্যের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে।

৩. **কৃষিখাতের দুর্বলতা**

- **আমদানিকৃত উপকরণের ওপর নির্ভরতা:** দেশের সার উৎপাদন আমদানিকৃত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) এবং পটাশের ওপর নির্ভরশীল, যা কৃষিখাতকে বৈশ্বিক সরবরাহ বিঘ্নের সামনে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।
- **খাদ্য নিরাপত্তার ওপর প্রভাব:** দুর্বল বর্ষা এবং সারের ক্রমবর্ধমান দাম খামারের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়, খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে তোলে এবং গ্রামীণ আয় ও ভোগ-ব্যয় হ্রাস করে।

৪. **দুর্বল গ্রামীণ সামাজিক নিরাপত্তা বলয়**

- **হ্রাসমান সামাজিক সুরক্ষা:** ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি বা মনরেগা (MGNREGA)-র মতো প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন নিয়ে তৈরি হওয়া উদ্বেগ গ্রামীণ পরিবারগুলোর কর্মসংস্থান নিরাপত্তাকে হ্রাস করেছে।
- **গ্রামীণ চাহিদা কমে যাওয়া:** গ্রামীণ আয় কমে যাওয়ার ফলে কেনাকাটা বা ভোগের পরিমাণ কমে যায়, যা দারিদ্র্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে ধীর করে দেয়।

৫. **বাহ্যিক খাতের ঝুঁকি**

- **প্রবাসী আয় এবং পরিষেবা খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা:** ভারতের চলতি হিসাব মূলত বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির বহুমুখীকরণের পরিবর্তে প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) এবং আইটি/পরিষেবা খাতের রপ্তানির ওপর ভর করে টিকে রয়েছে।
- **উদীয়মান বৈশ্বিক ঝুঁকি:** বিভিন্ন দেশের অভিবাসন-বিরোধী নীতি, ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত স্বয়ংক্রিয়করণ ভবিষ্যতে রেমিট্যান্সের প্রবাহ এবং পরিষেবা রপ্তানির আয় কমিয়ে দিতে পারে।

৬. **পুঁজি প্রবাহের অস্থিরতা**

- **অস্থির বিদেশী বিনিয়োগ:** বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের (FPI) দ্বারা বড় আকারে পুঁজি প্রত্যাহার প্রমাণ করে যে ভারত কতটা অস্থির ও স্বল্পমেয়াদী বৈশ্বিক পুঁজির ওপর নির্ভরশীল।
- **আর্থিক বাজারের ঝুঁকি:** হঠাৎ বাজার থেকে পুঁজি তুলে নেওয়ার ফলে শেয়ার বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, টাকার মান কমে যায় এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের আস্থা হ্রাস পায়।

৭. **প্রযুক্তির ব্যবধান**

- **সীমিত প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা:** শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সেমিকন্ডাক্টর, উন্নত যন্ত্রপাতি এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির জন্য ভারত এখনও আমদানির ওপর নির্ভরশীল।
- **ভবিষ্যতের প্রযুক্তিতে দুর্বল উপস্থিতি:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবোটিক্স, সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন এবং উন্নত গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) পর্যাপ্ত সক্ষমতা না থাকায় ভারতের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

৮. **উৎপাদন খাতের আশানুরূপ পারফরম্যান্স না থাকা**

- **ধীরগতির শিল্প রূপান্তর:** 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং পিএলআই (PLI) বা উৎপাদনভিত্তিক প্রণোদনা প্রকল্পের মতো উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও, উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাত দেশের GDP এবং কর্মসংস্থানে আশানুরূপ অবদান রাখতে পারেনি।
- **সীমিত রপ্তানি প্রতিযোগিতা:** দুর্বল উৎপাদন ক্ষমতার কারণে ভারত বিশ্ববাজারের একটি প্রধান ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং রপ্তানি পণ্যের তালিকায় বৈচিত্র্য আনতে হিমশিম খাচ্ছে।

৯. **কর্মসংস্থান এবং জনসংখ্যাগত চ্যালেঞ্জ**

- **জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের অনুন্নত ব্যবহার:** দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি না হওয়ার কারণে বিশাল তরুণ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

- **ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমবাজার:** উচ্চ মাত্রার অনানুষ্ঠানিক বা অসংগঠিত কর্মসংস্থান, স্থবির মজুরি এবং সীমিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগসমূহ

১. **দেশীয় উৎপাদন খাতকে শক্তিশালী করা**

- **প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা:** বিশ্ববাজারে ভারতের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বাড়াতে প্রযুক্তির ব্যবহার, শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং মূল্য সংযোজনকে (Value Addition) উৎসাহিত করা।
- **আমদানি নির্ভরতা কমানো:** স্বনির্ভরতা বাড়াতে এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও সুরক্ষিত করতে অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

২. **জ্বালানি রূপান্তর (সবুজ জ্বালানির দিকে অগ্রসর হওয়া)**

- **স্বচ্ছ জ্বালানি গ্রহণ ত্বরান্বিত করা:** সৌর, বায়ু এবং অন্যান্য পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎসের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো।
- **জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি:** জীবাশ্ম জ্বালানি বা খনিজ তেল আমদানি কমাতে গ্রীন হাইড্রোজেন, জৈব জ্বালানি (Biofuels), ব্যাটারি স্টোরেজ এবং অভ্যন্তরীণ জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

৩. **প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব**

- **ভবিষ্যতের প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), সেমিকন্ডাক্টর, রোবোটিক্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং উন্নত উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানো।
- **উদ্ভাবনী পরিবেশ শক্তিশালী করা:** দেশীয় উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প খাত, স্টার্টআপ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৪. **মানব সম্পদ উন্নয়ন**

- **ভবিষ্যতের উপযোগী কর্মক্ষম গোষ্ঠী তৈরি:** নতুন নতুন শিল্পের চাহিদা মেটাতে শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো।
- **গবেষণা ও উদ্ভাবন প্রসার:** প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

৫. **গ্রামীণ চাহিদা পুনরুজ্জীবিত করা**

- **গ্রামীণ জীবিকা শক্তিশালী করা:** আয়ের সুযোগ তৈরি করতে কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচিগুলোর প্রসার ঘটানো এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করা।
- **কৃষি আয় বৃদ্ধি:** গ্রামীণ কেনাকাটা বা ভোগ-ব্যয় এবং সামগ্রিক দেশীয় চাহিদা বাড়াতে খামারের উৎপাদনশীলতা এবং বাজার সংযোগের উন্নতি ঘটানো।

৬. **বাহ্যিক খাতের বহুমুখীকরণ**

- **উচ্চ-মূল্যের রপ্তানি বৃদ্ধি:** ঐতিহ্যবাহী আইটি এবং পরিষেবা খাতের বাইরে গিয়ে উৎপাদনমুখী এবং প্রযুক্তি-নিবিড় পণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করা।
- **বাহ্যিক ঝুঁকি কমানো:** বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধাক্কার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে রপ্তানি পণ্য এবং রপ্তানির গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য আনা।

ভবিষ্যতের করণীয় (Way Forward)

১. **জ্বালানি নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা**

- **অভ্যন্তরীণ জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি:** আমদানি নির্ভরতা কমাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ক্ষমতা এবং দেশের ভেতরে খনিজ অনুসন্ধানের কাজ বাড়ানো।
- **জালানি খাতের দুর্বলতা কমানো:** দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জ্বালানির উৎসগুলোতে বৈচিত্র্য আনা এবং জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২. **উচ্চ-প্রযুক্তিগত উৎপাদনকে উৎসাহিত করা**

- **কৌশলগত শিল্প গড়ে তোলা:** সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স এবং উন্নত উৎপাদন শিল্পে দেশের নিজস্ব সক্ষমতা তৈরি করা।
- **উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা:** গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) বিনিয়োগ বাড়ানো এবং সহায়ক নীতিমালার মাধ্যমে দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো।

৩. **মানব সম্পদে বিনিয়োগ**

- **দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা:** শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল দক্ষতার উন্নতি ঘটানো।
- **শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ শক্তিশালী করা:** উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প খাতের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৪. **গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করা**

- **গ্রামীণ জীবিকা শক্তিশালী করা:** কর্মসংস্থান তৈরির জন্য মনরেগা (MGNREGA) প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ বাড়ানো।
- **কৃষির বহুমুখীকরণ:** কৃষকদের আয় এবং গ্রামীণ চাহিদা বাড়াতে কৃষি-ভিত্তিক শিল্প এবং গ্রামীণ উদ্যোগগুলোকে সহায়তা দেওয়া।

৫. **বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করা**

- **নীতির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা:** বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে স্বচ্ছ নিয়মকানুন এবং অনুমানযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা প্রদান করা।
- **দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ আকর্ষণ:** ব্যবসা করার সহজীকরণ বা ইজ অব ডুইং বিজনেস উন্নত করা এবং দেশী ও বিদেশী উভয় ধরনের বিনিয়োগকে সহজতর করা।

৬. **বাহ্যিক প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি**

- **বাণিজ্য ও জ্বালানির উৎস বহুমুখীকরণ:** জ্বালানি সরবরাহকারী দেশ এবং রপ্তানি বাজারের পরিধি বাড়িয়ে মাত্র কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা।
- **বাহ্যিক স্থিতিশীলতা জোরদার করা:** বৈশ্বিক ধাক্কার বিরুদ্ধে চলতি হিসাবের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ গড়ে তোলা।

উপসংহার

ভারতের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সাফল্য কেবল উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার ওপরই নির্ভর করবে না; বরং বহির্বিশ্বের ওপর নির্ভরতা কমানো, মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান তৈরি করা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা জোরদার করা, গ্রামীণ চাহিদা পুনরুজ্জীবিত করা এবং

শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপরও নির্ভর করবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত সফলভাবে একটি উন্নত অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে পারবে কি না, তা নির্ধারণ করবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, উদ্ভাবন-চালিত এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

Q. Despite being one of the fastest-growing major economies, India continues to face significant structural economic challenges. Examine the major vulnerabilities in India's growth model and suggest measures for building a resilient and inclusive economy. 15 Marks

3.2. পরিবেশ

3.2.1. ভারতের খণ্ডবিখণ্ড শিল্প জলবায়ু কৌশল: শিল্পকারখানার কার্বনমুক্তকরণের অনুপস্থিত যোগসূত্র

সাম্প্রতিক খবরে কেন এটি আলোচনায় এসেছে?

ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC)-এর কাছে জমা দেওয়া ভারতের প্রথম **দ্বিবার্ষিক স্বচ্ছতা প্রতিবেদন (BTR-1)** থেকে জানা গেছে যে, দেশের মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের **২০%-এরও বেশি আসে শিল্পক্ষেত্র থেকে**। এর মধ্যে প্রায় **৪০% নির্গমন ঘটে "অনির্দিষ্ট শিল্পখাত" (Non-Specific Industries) থেকে**, যা বর্তমান কার্বনমুক্তকরণ নীতির আওতার বাইরেই রয়ে গেছে।

ভূমিকা

ভারতের **'মেক ইন ইন্ডিয়া'**, **'বিকশিত ভারত@২০৪৭'** এবং **'২০৭০ সালের মধ্যে নেট-জিরো'** লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দ্রুত শিল্প বৃদ্ধি প্রয়োজন। কিন্তু ক্রমাগত বাড়তে থাকা শিল্প নির্গমন এবং **প্যাট (PAT)** ও **সিসিটিএস (CCTS)**-এর সীমিত পরিধি ভারতের কার্বনমুক্তকরণ কৌশলের বড় ফাঁকফোকরগুলিকে সামনে এনে দিয়েছে।

শিল্পক্ষেত্র এবং ভারতের নির্গমন চিত্র

প্রথম দ্বিবার্ষিক স্বচ্ছতা প্রতিবেদনের (BTR-1) মূল ফলাফলসমূহ:

- দেশের মোট নির্গমনের **২০%-এরও বেশি অবদান রাখছে শিল্পক্ষেত্র**।
- উৎপাদন শিল্প এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত **জ্বালানি ব্যবহার থেকে প্রায় ১৩% নির্গমন** হয়।
- **শিল্প প্রক্রিয়া এবং পণ্য ব্যবহার (IPPU) থেকে আরও ৯% নির্গমন** ঘটে।
- অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং নগরায়নের সাথে সাথে শিল্পখাতের নির্গমন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিল্পক্ষেত্র কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

- ভারতের **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মূল ভিত্তি** হলো এই শিল্পক্ষেত্র।
- এটি বাণিজ্যিক শক্তির একটি **প্রধান ভোক্তা**।
- **২০৭০ সালের মধ্যে নেট-জিরো** লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- এটি নির্ধারণ করে যে ভারত কীভাবে নিজের **উন্নয়নের সাথে জলবায়ু কর্মপরিকল্পনার ভারসাম্য** বজায় রাখবে।

নির্গমনের ধাঁধা:

- চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট শিল্প খাতগুলি উৎপাদন খাতের নির্গমনের প্রায় **৫৫% অবদান** রাখে।
- কিন্তু নির্গমনের প্রায় **৪০% "অনির্দিষ্ট শিল্পখাত"-এর অধীনে** শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।
- ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের প্রতিবেদনেও একই ধারা দেখা গেছে, যা নির্দেশ করে যে এটি **নীতিগতভাবে একটি দীর্ঘস্থায়ী অন্ধবিন্দু বা অবহেলিত দিক**।

ভারতের বর্তমান শিল্প কার্বনমুক্তকরণ কাঠামো

১. **পারফর্ম, অ্যাচিভ অ্যান্ড ট্রেড (PAT) স্কিম (সম্পাদন, অর্জন ও বাণিজ্য প্রকল্প)**

- **উদ্দেশ্য:** শক্তি-নিবিড় খাতগুলিতে উৎপাদিত পণ্যের প্রতি ইউনিটে শক্তির ব্যবহার হ্রাস করে **শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি করা**, যার ফলে সামগ্রিক শিল্পের শক্তির চাহিদা এবং নির্গমন হ্রাস পায়।
- **আওতাভুক্ত ক্ষেত্র:** এর মধ্যে রয়েছে **তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থা (DISCOMs), বাণিজ্যিক ভবন** এবং সিমেন্ট, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, সার ও কাগজের মতো প্রধান প্রধান **শক্তি-নিবিড় শিল্পসমূহ**।
- **কার্যপদ্ধতি:** সরকার নির্দিষ্ট বড় ভোক্তাদের জন্য শক্তির ব্যবহার হ্রাসের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়। যে সমস্ত সংস্থা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি শক্তি সাশ্রয় করে, তারা **এনার্জি সেভিং সার্টিফিকেট (ESCerts)** বা শক্তি সাশ্রয় শংসাপত্র পায়, যা লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হওয়া সংস্থাগুলির সাথে কেনাবেচা করা যায়।

২. **কার্বন ক্রেডিট ট্রেডিং স্কিম (CCTS) (কার্বন ক্রেডিট বাণিজ্য প্রকল্প)**

- **উদ্দেশ্য:** বাজার-ভিত্তিক কার্বন মূল্য নির্ধারণ এবং বাণিজ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রগুলিতে **গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের তীব্রতা হ্রাস করা**।
- **আওতাভুক্ত ক্ষেত্র:** এর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট, সার, লোহা ও ইস্পাত, পেট্রোকেমিক্যালস, পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি, পাল্প ও পেপার, টেক্সটাইল এবং ক্লোর-অ্যালকালি শিল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ভারতের **প্রধান শিল্প নির্গমনকারী ক্ষেত্র**।
- **কার্যপদ্ধতি:** খাত-ভিত্তিক নির্গমনের মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যে শিল্পগুলি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি নির্গমন কমাতে পারে তারা **কার্বন ক্রেডিট** অর্জন করে। এই ক্রেডিটগুলি এমন সংস্থাগুলির কাছে বিক্রি করা যায় যারা তাদের নির্গমন হ্রাসের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারেনি।

বর্তমান শিল্প কার্বনমুক্তকরণ মডেলের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **সীমিত ক্ষেত্রের আওতা:** বর্তমান ব্যবস্থা যেমন— প্যাট (PAT) এবং সিসিটিএস (CCTS) মূলত ঐতিহ্যবাহী ভারী নির্গমনকারী শিল্পগুলিকে লক্ষ্য করে তৈরি। ফলে **"অনির্দিষ্ট শিল্পখাত" থেকে নির্গত একটি বিশাল অংশের নির্গমন** এই নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর বাইরেই থেকে যায়।

২. **নিখুঁত নির্গমন তথ্যের অভাব:** অনির্দিষ্ট শিল্পের ব্যাপক ও অস্পষ্ট শ্রেণিবিভাগের কারণে নির্গমনের আসল উৎসগুলি আড়ালে রয়ে যায়। এর ফলে **অধিক নির্গমনকারী উপ-ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা** এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৩. **দুর্বল নজরদারি ও জবাবদিহিতা:** খাত-ভিত্তিক সঠিক বিভাজনের অভাবে নির্গমনের ধারা কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা, **নীতির ফলাফল মূল্যায়ন করা** এবং প্রধান দূষণকারীদের চিহ্নিত করা বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. **নীতি এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ঘাটতি:** বিস্তারিত শিল্প মানচিত্র বা ম্যাপিং না থাকার কারণে নীতিগত অন্ধবিন্দু তৈরি হচ্ছে, যা নতুন এবং **পূর্বে অনিয়ন্ত্রিত শিল্পগুলিতে নির্গমন হ্রাসমূলক ব্যবস্থা** সম্প্রসারণে বাধা দিচ্ছে।

৫. **শিল্প বৃদ্ধি এবং জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অমিল:** 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'বিকশিত ভারত'-এর অধীনে দ্রুত শিল্প বহুমুখীকরণ ঘটলেও তা **জলবায়ু প্রশমন কৌশলের সাথে পর্যাপ্তভাবে একীভূত নয়**, যার ফলে নীতি প্রণয়ন খণ্ডবিখণ্ড রয়ে গেছে।

৬. **নেট-জিরো লক্ষ্য এবং ন্যায্য রূপান্তরের ঝুঁকি:** শিল্প নির্গমনের প্রায় ৪০% অংশকে এই কাঠামোর বাইরে রাখার ফলে তা ভারতের কার্বনমুক্তকরণের পথকে দুর্বল করে। একই সাথে এটি **নির্দিষ্ট কিছু শিল্পের ওপর অতিরিক্ত কমপ্লায়েন্স বা নিয়ম মেনে চলার বোঝা** চাপিয়ে দেয়।

আগামী দিনের পথ বা করণীয় পদক্ষেপ

১. **"অনির্দিষ্ট শিল্পখাত" বিভাজন করা:** সরকারের উচিত অনির্দিষ্ট শিল্পখাতের অধীনে থাকা শিল্পগুলিকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ও শ্রেণিবদ্ধ করা, যাতে **নির্গমনের উৎসগুলি সঠিকভাবে খুঁজে বের করে** লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

২. **CCTS এবং PAT-এর পরিধি বাড়ানো:** ব্যাপক শিল্প কার্বনমুক্তকরণ এবং সমান আইনি কভারেজ নিশ্চিত করতে ভারতের কার্বন বাণিজ্য এবং শক্তি দক্ষতা কাঠামোতে **বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত না থাকা খাতগুলিকে পর্যায়ক্রমে যুক্ত করা** উচিত।

৩. **খাত-ভিত্তিক কার্বনমুক্তকরণ রোডম্যাপ তৈরি করা:** বিভিন্ন শিল্পের প্রযুক্তিগত পরিপক্কতা, শক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং নির্গমনের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে **আলাদা রূপান্তর কৌশল** তৈরি করা উচিত, যা একটি বাস্তবসম্মত সবুজ রূপান্তরকে সহজতর করবে।

৪. **শিল্প নির্গমন ডেটাবেস শক্তিশালী করা:** তথ্যের নির্ভুলতা, নীতি মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি উন্নত করতে একটি **শক্তিশালী ও রিয়েল-টাইম (তাৎক্ষণিক) নির্গমন পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা** প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

৫. **জলবায়ু প্রতিবেদনে স্বচ্ছতা আনা:** তথ্য-ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন এবং জলবায়ু পরিচালন ব্যবস্থার জবাবদিহিতা জোরদার করতে **আরও বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্গমন তালিকা** প্রকাশ করা উচিত।

৬. **পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি:** কার্বন ফুটপ্রিন্ট বা নির্গমন কমাতে শিল্পগুলিকে **গ্রিন হাইড্রোজেন**, নবায়নযোগ্য শক্তি, প্রক্রিয়াকরণের বিদ্যুতায়ন, **কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তি** এবং সার্কুলার ইকোনমি (চক্রাকার অর্থনীতি) গ্রহণে উৎসাহিত ও প্রণোদনা দেওয়া উচিত।

৭. **শিল্প নীতির সাথে জলবায়ু লক্ষ্যগুলির একীকরণ:** টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'মেক ইন ইন্ডিয়া', **জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন**, নেট-জিরো কৌশল এবং অন্যান্য শিল্প উন্নয়ন নীতিগুলির মধ্যে জলবায়ু লক্ষ্যগুলিকে যুক্ত করা আবশ্যক।

৮. **প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদার করা:** সুসংগত নীতি প্রণয়ন এবং কার্বনমুক্তকরণ কৌশলের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য **পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, বিদ্যুৎ মন্ত্রক, ভারী শিল্প মন্ত্রক এবং নীতি (NITI) আয়োগের** মধ্যে আরও ভালো সমন্বয় প্রয়োজন।

উপসংহার

ভারত প্যাট (PAT) এবং সিসিটিএস (CCTS)-এর মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রের কার্বনমুক্তকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করলেও, **২০৭০ সালের মধ্যে নেট-জিরো** লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে চিরাচরিত খাতের বাইরে পরিধি বাড়াতে হবে। একই সাথে নির্গমনের স্বচ্ছতা উন্নত করা এবং সমস্ত প্রধান শিল্প নির্গমনকারীকে একটি **বিস্তৃত জলবায়ু প্রশমন কাঠামোর অধীনে আনা** অত্যন্ত জরুরি।

Q. Industrial decarbonisation is critical for achieving India's net-zero target. Examine the limitations of India's current industrial climate strategy and suggest measures to improve emission mitigation across all industrial sectors. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM

IAS 10-Month GS PCM

Degree + IAS

Prelims Test Series

Click here to watch this video